The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

মহাদেব সাহার কবিতা : শব্দচেতনা

[Mahadeb Saha's Poetry: Word Consciousness]

Dr. Tania Tahmina Sarkar
Professor, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 25 May 2025
Received in revised: 03 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Mahadeb Saha, 1960s Bangladesh poetry, word consciousness, poetic themes, word usage, simplicity in poetry, craftsmanship in poetry.

ABSTRACT

Mahadeb Saha is a distinct name in the poetry of 1960s Bangladesh. While navigating the atmosphere of the '60s, he created a path rich in art through his themes and craftsmanship. His poetry is marked by an introspective, solitary, and romantic language of life. Through the diversity of themes in his poetry, he has demonstrated a keen awareness centered around words. The words used in his poems, along with their nuanced meanings, play a pivotal role in creating subtle implications. Rather than using elevated or negative words, he constructs the form of his poetry through the use of gentle, soft, tender, and simple word clusters. His main strength lies in using simple, and clear words. By using ordinary expressions, he has built his own path in poetry. The aim of this research is to uncover his skill and technique in word usage within his poetry. Through an exploration of Mahadeb Saha's word-consciousness, this study enriches the topic of word-centric poetic practice.

মানব অনুভূতির শব্দময় প্রকাশ হলো কবিতা। কবিতা শব্দসমষ্টি হলেও তা শব্দাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার প্রকাশ। বাংলাদেশের কবিতা বিশ শতকের তিরিশের কালের উত্তরাধিকার। ফলে প্রকরণগত নিরীক্ষার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়েছে তিরিশের কাব্যক্ষেত্রের উপরে, যার প্রভাব পড়েছে ষাটের দশকে। প্রকরণ অন্বেষায় এ দশকের কবিতা কবিদের বিচিত্র অনুসন্ধিৎসু মনের স্মারক বহন করছে। ষাটের দশকে একদল নতুন কবি কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। 'এরা আঙ্গিক ও প্রকরণে, প্রজ্ঞা ও মননে, রুচি ও বৈদগ্ধ্যে আধুনিকতামণ্ডিত হয়ে ওঠেন।'[১] এ পর্বের অন্যতম কবি রফিক আজাদ (১৯৪১-২০১৬), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), আসাদ চৌধুরী (১৯৪৩-২০২৩), মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪), নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) প্রমুখ। লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে তাঁদের কাব্যপ্রচেষ্টার সূত্রপাত হলেও ষাটের অস্থির সময় ও দোদুল্যমান জীবন তাঁদের ভিন্নপথের পথচারী করে তোলে: 'বস্তুত রাষ্ট্রিক উপনিবেশ, অবরুদ্ধতা, অস্তিত্বহীনতার নিরলম্বতাকে তাঁরা ধারণ করেছেন কবিতার শরীরে। ফলত একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির প্রকরণ হয়ে উঠেছে স্ব-স্ব মনোভূমির প্রত্নবীজ।'[২]

এ কারণে রফিক আজাদ, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ বা আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রকরণ ও মেজাজে ভিন্নতা বহন করছেন। 'আবুল হাসানে যা হতাশায় বিবর্ণ, গুণে উচ্চকিত, মহাদেব সাহা আত্মতায় মগ্ন, রফিক আজাদে তা ঘোষণায় উচ্চগু।'[৩]

মহাদেব সাহা আত্মমগ্নতা ও নিঃসঙ্গতার কারণে ষাটের অন্যান্য কবি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। সমসাময়িক পরিস্থিতি, রাজনীতি ও সামাজিক কারণে মহাদেব সাহার কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্যের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। শিল্পসৌকর্যেও তাঁর নিজস্ব ঢংয়ের পরিচয় মেলে। বিশেষত বিষয়নির্মাণ ও শিল্পপ্রকৌশলে শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ তাঁর কবিসত্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। ষাটের কবিদের মধ্যে আবুল হাসান বা নির্মলেন্দু গুণের সাথে তাঁর কাব্যচিন্তার সাযুজ্য থাকলেও শব্দপ্রয়োগের নিপুণতা ও বিশুদ্ধ আবেগনির্ভর শব্দমালা রচনার জন্য তিনি নিজস্ব ভাষারীতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। মহাদেব সাহার কবিতার শক্তি তাঁর শব্দচয়ন। শব্দকেন্দ্রিক নিরীক্ষা নয় বরং শব্দসচেতনতা তাঁকে ষাটের কবিদের থেকে পৃথক করে তুলেছে। ফলে মহাদেব সাহার কবিতায় শব্দচেতনা একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ, 'This must surely be obvious as regards poetry : Imagery is its very life'.[৪] কবিতার ব্যঞ্জনা নির্ভর করে ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দোত্তর অর্থের উপরে। ফলে মহাদেব সাহার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহারের কৌশল নির্ণয় করলে তাঁর কবিতার ব্যঞ্জনা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

মহাদেব সাহা তাঁর কবিতাভুবনে এক স্বতন্ত্র স্বর বিনির্মাণ করেছেন। কাব্যের স্ব-মানচিত্র নির্মাণে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন নিজস্ব বাণী ও কথনভঙ্গির কারণে। ষাটের কবিদের বর্ণনাত্মক ভঙ্গির সাথে তাঁর লেখার সাযুজ্য থাকলেও ভাবের গভীরতায় তিনি আত্মমগ্ন, খানিকটা অক্রিয়ও বটে। অবশ্য:

> ষাটের পর্বে আবির্ভূত এই কবিকুলের বৈশিষ্ট্য: প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তারা কবিতার ভাষায় হয়ে উঠেছেন আরো দুঃসাহসী, প্রত্যক্ষধর্মী। দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দ, মুখের ভাষা বা বাকভঙ্গীকে গ্রহণ করে কবিতার প্রসঙ্গে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন সহজ নিরাভরণ সৌন্দর্য।[৫]

মহাদেব সাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *এই গৃহ এই সন্ন্যাস* প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামেই শব্দ সম্পর্কিত তাঁর সচেতনতা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিতার শরীর বিনির্মাণে শব্দ অত্যাবশ্যক একটি উপাদান। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) শব্দের গুরুত্ব স্বীকার করে তাঁর "Lyrical Ballads" (1798) গ্রন্থে বলেছেন, 'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings'.[৬] অর্থাৎ Powerful Feelings যখন Spontaneously বের হয় তখন শব্দই একমাত্র কবিতার মৌলভাব প্রকাশের উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ 'Poetry is excellent words in excellent arrangement and excellent metre.'[৭] শিল্পঋদ্ধ পথে যাত্রা শুরু করার এক উন্মুল বাসনা থেকে মহাদেব সাহা কবিতা লেখা শুরু করেন। আজন্মলালিত স্বপ্ন কবি হওয়ার তাগিদে নিজের বহিরঙ্গে পরিবর্তন এনেছেন সচেতনভাবেই। সে সচেতনতাই তাঁকে তাড়িত করেছে শিল্পসৌকর্যের কঠিন নিগড়ে কবিতার ভাব ও ভাষাকে প্রকাশ করতে। সত্য ও সুন্দরের পূজারি কবি কীটসের (১৭৯৫-১৮২১) মতো মহাদেবও বিশ্বাস করেন, 'Truth is beauty, Beauty is truth',[৮] ফলে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) মতো তিনিও স্নিগ্ধ ও কোমল শব্দকে বেছে নেন নিজের কবিতার অবয়ব বিনির্মাণে। মহাদেব সাহা শব্দকে কবিতার প্রাণ বলে মনে করেন। তাঁর বিচারে শব্দ শিল্পসাহিত্যের প্রধান মাধ্যম। কবির মনের ভাব ও মানসিক শ্রম শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই শব্দ তাঁর ভালোবাসা ও শান্তির অংশ। শব্দের মাধ্যমে আবেগ প্রকাশিত হলে শব্দ তাঁর জড়ত্ব ত্যাগ করে চলিষ্ণু ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে:

> শব্দ আমার ভালবাসার পাত্র
> মাত্র তাকে দিয়েছি এই শান্তি কোমল শান্তি
> আরো অনেক দিনের দাহ, রাতের হেমকান্তি
> তবেই হবে শব্দ আমার গভীর প্রিয় পাত্রী![৯]

প্রথম কাব্যগ্রন্থ *এই গৃহ এই সন্ন্যাসে* তার ছাপ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে' বলে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসব্রত ধারণে গৃহত্যাগ করার ইঙ্গিত দিলেও মহাদেব তাঁর গৃহী জীবনেই সন্ন্যাসী জীবন যাপনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মানুষ গৃহী হয় স্নেহের টানে, কিন্তু পরমাত্মা বা দার্শনিক উপযোগিতার প্রভাবে মানুষ ঘর থেকে পৃথিবীর পথে পা বাড়ায়। কিন্তু বন্ধনবৃত্তে আবদ্ধ মানুষ ঘর ছাড়তে পারে না, বৃহৎ অনুষঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করতে পারে না। দ্বিধা আর টানাপড়েনে না গৃহী না সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে। কবিতাময় জীবনযাপন করতে গিয়ে মহাদেব সাহার মতো বেশিরভাগ কবিই ঘরহীন ঘর বাঁধেন। সংসারের একজন হয়ে থাকলেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তাঁরা বসবাস করেন। এই গৃহী সন্ন্যাসীদের প্রতীক হয়ে মহাদেব যেন নিজের স্বরূপ উন্মোচন করেন প্রথম কাব্যগ্রন্থেই।

কবিতাচর্চায় মহাদেব সাহা সক্রিয়ভাবে শব্দ সচেতন নন। তবে পারিপার্শ্বিক সমাজ, সমসাময়িক রাজনীতি, বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তাঁর মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে কবিতা রচনার নৈপুণ্যে শব্দবিন্যাসের নিপুণতা সম্পর্কে তিনি অসচেতনভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন। যেমন:

> আমার শরীরে চোখে হৃদয়ে কেবল জ্বলে ক্ষুধা,
> ক্ষুধার দীর্ঘ গ্রীবা স্থবির জন্তুর মতো মেলে দেয় লোলুপতা, অভ্যন্তরে
> হৃদযন্ত্রে, মস্তিষ্কের সেলে ক্ষুধার তীব্র নখ ভয়ঙ্কর জ্বলে
> যেন এক সর্বাঙ্গে সহস্র চোখ মাছি ঘুরে আমার
> চোখের ভিতর থেকে মাংস তুলে খায়, আমার হৃদয় থেকে
> তুলে খায় সুমিষ্ট গোলাপ,[১০]

চিৎকৃত শব্দের ঋণে আবদ্ধ না থেকেও মহাদেব এই কবিতাংশে কাব্যভাষায় পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী বিস্তার এবং ইতিবাচকতার বিলোপ নিশ্চিত করেছেন। 'ক্ষুধার দীর্ঘ গ্রীবা' 'স্থবির জন্তুর মতো লোলুপতা' মেলে উপমার প্রেক্ষাপটে সমাসোক্তি অলংকার নির্মাণে মহাদেব সাহার সাফল্য ঘোষণা করে। সর্বত্র চোখবিশিষ্ট মাছিরূপ পুঁজিবাদের তীব্র নখরে দৃষ্টির তীব্রতা ম্লান হয়ে ওঠে। তাই কবির কোমল হৃদয় থেকে 'গোলাপ' ছিন্ন করে তার মাধুর্য জিভে আস্বাদ করে নিজের বীভৎসতার প্রমাণ দেয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কোমল হৃদয়ের যে কোনো স্থান নেই, কবি তা শব্দের অনুষঙ্গে প্রমাণ করে দেন। মহাদেব সাহা এভাবেই শব্দের নিহিতার্থ অন্বেষণ করে তাঁর কবিমানস ও সমাজবীক্ষণের স্বরূপ তুলে ধরেন। পুঁজিবাদের অদৃশ্য রাজার হাতে শূন্য হয় হৃদয় ভাঁড়ার, মানবিক রসদশালা। এমনকি তার হাত থেকে মুক্তি পায় না সবুজ প্রান্তর থেকে ছিঁড়ে আনা ফলও। 'সবুজ' শব্দটির মাধ্যমে শান্ত, স্নিগ্ধ, সজীব জীবন এবং এক নিশ্চিত প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। মহাদেব সাহার কবিতায় 'সবুজ' শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত। যেমন:

১. আমি চাই প্রত্যহ আপনাকে লিখতে চিঠি, আমি চাই প্রতিদিন
লিখতে এই রক্তের গভীর ইচ্ছে, মর্মান্তিক অনুভবগুলি
আমার **সবুজ** সুখ, কোমল আনন্দ, নির্জন কান্নার স্বর[১১]

২. এরোপ্লেন, হায় উভচর পাখি
শূন্যে বৃথাই বুনে দিলি **সবুজ** বনের স্বপন[১২]

৩. প্রকৃতির কাছ থেকে কিছু **সবুজ** আর শুভ্রতা
আহরণ করে
শিশুদের বৈকালিক আনন্দের জন্যে রেখে দেবো।[১৩]

৪. দেখবে তার হৃদয়ে লুকিয়ে আছে কতো **সবুজের** স্বপ্ন
লুকিয়ে আছে কতো স্থাপত্য ও শৈলীর সম্ভাবনা।[১৪]

এভাবে সবুজ শব্দের মাধ্যমে মহাদেব বিনির্মাণ করেছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জীবনের স্বপ্ন, সাধ। অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জীবনের প্রতীক হয়ে সবুজ শব্দটি তাই মহাদেবের শব্দনির্মিতির উদাহরণ হয়ে ওঠে। তবে কবিতা লেখার প্রাক্কালে এমন বিশেষ শব্দকে বিশেষ অনুষঙ্গে ব্যবহার করা কঠিন। শব্দের সাথে মননের যোগসূত্র তৈরি হলে তখন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হৃদয়সংযোগ স্থাপন করে। এ সংযোগ শুধু কবির সঙ্গে শব্দের নয় বরং পাঠকের সঙ্গেও।

আত্মগত বেদনা মহাদেব সাহার কবিতার প্রধান বিষয়। দুঃখবাদী চেতনার প্রকাশে বিশেষ কিছু শব্দের আবর্তন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। এসব শব্দের মাধ্যমে ব্যক্তিগত দুঃখবোধ, নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, স্বেদ ও দীর্ঘ তমসাকে প্রকাশ করেছেন তিনি। যেমন: সন্ত্রস্ত, মূল্যবোধহীন, হিংসা, দুঃখবোধ, সংকীর্ণ, পীড়িত, বিচ্ছিন্ন, অসহায়, অনাবৃষ্টি, রুদ্র, পোড়া মাঠ, রুগ্ন, নিঃশব্দ আঁধার, ম্লান, ফ্যাকাসে চোখ, ম্লান জ্যোৎস্না, দুঃখদাহ, বিষাদ, নিঃশব্দতা, রক্তের বিষ, জিরাফের মতো গ্রীবা, কান্নার করুণ ভেলা, হৃদয়ের হৃতরাজ্য, নির্জন ভেলা, বন্দী স্বাধীন, নৈঃশব্দ, অরণ্যের অবসাদ, আর্ত আহত অক্ষম, ফাটল ধরা বুক ইত্যাদি। এক অবক্ষয়ী মূল্যবোধহীন পুঁজিবাদী সমাজে একজন মানবিক কবির মুক্তির অবকাশ ক্ষীণ। এ কারণে কবি তখন উন্মুল জীবনের টানাপড়েন বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের আর্তি তুলে ধরেন কবিতার ক্যানভাসে:

হে আমার দুঃখগুলি তোমার জন্য অমল রোদনে
মালা গাঁথার সময় তো নেই,
অশ্রু দিয়ে তোমার জন্যে কীভাবে উজ্জ্বল ঘর বানাবো
বলো, হে আমার দুঃখগুলি
জীবনের দায় আজ হৃদয়ের চেয়ে ঢের বড়ো[১৫]

নাগরিক যান্ত্রিকতায় নিঃসঙ্গ ব্যক্তির হতাশা ফুটে উঠেছে মহাদেব সাহার কবিতায়। বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত উত্তরাধুনিক মানুষের নৈকট্যের আড়ালে দীর্ঘ দূরত্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অতি সাধারণ শব্দের গাঁথুনিতে। 'একই পাড়ায় থাকে লোক/ অথচ এ ফ্লাটে সে ফ্লাটে যেতে/ বাজাতে হয় দীর্ঘ কলিংবেল'[১৬] এমন যাদের সম্পর্ক তারা অহমবোধের অবগুণ্ঠনে আবদ্ধ রাখে নিজেদের। সম্পর্কের এমন শিথিলতা বোঝাতে কবি উচ্চারণ করেন:

দুজনেই বাস করি একই ঘরে
একই বালিশে মাথা রাখি শুয়ে
দুজনেই দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি
তবু তোমার আমার দেখা হয় না আর।[১৭]

প্রবল দুঃখবোধে জারিত কবির অস্তিত্বে হাহাকারের লক্ষণ অসুস্থতার মতোই ফুটে উঠেছে। বিমর্ষ, দুঃখী কবি হতাশ হয়ে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন দুঃখের কাছে। দুঃখচারী কবি দুঃখবাদী চেতনায় প্রবলভাবে নিমজ্জিত হয়ে শব্দের গায়েও লেপন করেন দুঃখের কালিমা:

যতো দুঃখ আছো যতো কাতরতা আছো যতো বিপন্নতা আছো মানুষের
যতো শোক আছো সন্তাপ আছো বিমর্ষ হাহুতাশ আছো
যতো দীর্ঘশ্বাস, যতো দুঃস্থ যতো দীর্ণ যতো কান্নাক্লেশ আছো
আমি তোমাদের জন্য ফুলের মতো গভীর এই বুক,
আগুনের মতো আন্তরিক
এই চোখ, শস্যের মতো স্বাধীন এই হাত উৎসর্গ করেছি।[১৮]

কবিতা ব্যাকরণসিদ্ধ বা অভিধাননির্ভর নয়। কবিতা হৃদয়মুখী। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারও দুরন্ত পথিকের মতো কবিতার মধ্যে নিজের পথ তৈরি করে পাঠকের হৃদয়ে বার্তা পাঠায়। এভাবে শব্দের মায়াজালে কবির বিষয়নির্মাণের প্লট গড়ে ওঠে। নির্বাচিত শব্দাবলির প্রতি বিশেষ ঝোঁক না দেখিয়ে মহাদেব সাহা সমাজের প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। দৈনন্দিন আয়োজনে ব্যবহৃত শব্দাবলিকেই তিনি শব্দপ্রকৌশলে স্তরে স্তরে সাজিয়ে তুলেছেন। তবে প্রয়োগের নৈপুণ্যে এই সাধারণ শব্দসমষ্টিই বিশেষ বোধ উন্মোচন করেছে পাঠকের সামনে। যেমন:

... সে আমার চিরদিন যোগাবে ঘুমের ওষুধ
আমার অপরাধের ছুরি রেখে দেবে তার বুকের তলায়...
যে আমাকে নিয়ে যাবে সুন্দরবনে হরিণ শিকারে, হরিণের শিং থেকে
তার স্বচ্ছ খুর থেকে খুঁটে নেবে দামী অংশগুলি যেন ও গাভীর
খুর থেকে বানাবে বোতাম, সে
আমাকে প্রতিদিন ধার দেবে লোভ, এখানে
সেখানে শহরের পরিচিত অঞ্চলগুলিতে আমি সেই সরল সাঙাতটিকে খুঁজি...[১৯]

'অপরাধের ছুরি', 'স্বচ্ছ খুর থেকে খুঁটে নেওয়া', 'ধার দেবে লোভ', 'সরল সাঙাত'– বহুল প্রচলিত এই শব্দগুলোকে মহাদেবের কবিতায় নিছক শব্দ মনে হয় না। লোভ যে ধার দেওয়া চলে কিংবা সাঙাত শব্দটি কবিতায় ব্যবহৃত হতে পারে এ চমকে পাঠক ভুলেই যান ব্যবহৃত শব্দের প্রাত্যহিকতা। ধ্বনিসমষ্টির পুনরাবৃত্তে ব্যবহৃত অনুপ্রাসের সৃজনকৌশলের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে মহাদেবের শব্দ শব্দ খেলা। শব্দকে ছুঁয়ে, ছেঁনে, কেটে তিনি যেন এক কোমল মূর্তি বানান কবিতার; যেখানে শব্দের স্রোতে ভেসে যায় প্রাত্যহিক শব্দের দৈনন্দিন মলিনতা। এভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার গুণে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে মহাদেবের কবিতার শব্দবন্ধন প্রক্রিয়া:

জলের গভীরে তুমি জলমগ্ন হয়ে আছো
অবিকল জলের শরীর
রৌদ্রে আছো রৌদ্রময় রৌদ্রের নিজস্ব প্রতিভা,
রৌদ্রে থেকে রৌদ্র হরণ করো
জলে থেকে জলের আকার
হরণপ্রয়াসী তুমি, তুমি বড়ো হরণইচ্ছুক![২০]

ষাটের দশকের কবিরা সমাজ ও রাজনীতির জটিল আবর্তে নিমজ্জিত হতে হতে নতুন এক পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন:

> সময়ের নখরবিক্ষত এ সকল কবি পূর্বতন ধারা অঙ্গীকারের প্রশ্নে ছিলেন নির্মোহ। তিরিশের কাব্যভাবনায় বীতশ্রদ্ধ এ সকল কবির কাছে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গীয় কবিতার বিষয় ও প্রকরণ রীতি হয়ে উঠলো আরাধ্য। কারো কারো মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিলো বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় কবিতা অনুকরণের আত্যন্তিক প্রয়াস।[২১]

মহাদেব সাহা সমকালীনতা ও সতীর্থ কবিদের এড়িয়ে আত্মমগ্ন হয়ে কবিতা ভুবনে নিজস্ব কাব্যভাষা ও রীতি নির্মাণের চেষ্টায় সাধারণ শব্দকে বেছে নেন। বীট, হাংরি, শ্রুতি বা স্যাড জেনারেশনের কবিতা আন্দোলনকে এড়িয়ে তিনি নিমগ্ন হন আত্মগত রোমান্টিক অনুভবে। এ অনুভূতি প্রকাশে তাঁর সহায়ক সহজ ও প্রাঞ্জল শব্দ যা সাবলীলভাবে কবি ও পাঠকের মধ্যে সংযোগসেতু স্থাপন করেছে। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি সচেতনভাবেই সহজ, পরিচিত অথচ তাঁর চিন্তা ও দর্শনজাত শব্দাবলি চয়ন করেছেন। মহাদেব সাহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞান, গ্রামীণ জীবনের প্রতি দুর্বলতা, বিবৃতিপ্রাধান্যতাও তাঁকে সাধারণ শব্দের প্রতি ধাবিত করেছে। অনায়াস মুন্সিয়ানায় নিতান্তই অবহেলায় যেন এক কুমোর গড়ে যাচ্ছেন তার ইপ্সিত মাটির পাত্র!

কবিতা লেখার সূচনাপর্বে মহাদেব জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) সৃজনকৌশলের অনুরাগী ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ সরল শব্দের বুননে জীবনবোধ ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরি করেছেন কবিতার অবয়ব। গদ্যগন্ধী শব্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যে প্রচুর। মহাদেব সাহার কবিতা জীবনানন্দীয় ঢঙে সাধারণ শব্দব্যবহারের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। ছাত্রাবস্থায় শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নে মার্কসবাদী চেতনায় রাজনীতির দীক্ষা নেন তিনি। ফলে কলাকৈবল্যবাদ নয় জীবনের জন্য শিল্প নীতিতে বিশ্বাস গড়ে তোলেন, যার প্রভাব পড়েছে তাঁর কবিতার শরীরেও। সাধারণের বোধগম্য শব্দ ব্যবহার তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস অটুট থাকার প্রমাণ বহন করে। ফলে অপরকে হরণইচ্ছুক বলে তিনি আসলে অতি ব্যবহৃত শব্দের নিস্প্রভতাকে হরণ করেন। প্রার্থিত শব্দ দৈনন্দিন আয়োজনে অতিপ্রয়োগের ফলে তার সংযোগশক্তির দৃঢ়তা হারায়। শব্দের উজ্জ্বলতাও তার সম্ভাব্যতা হারায় বিবর্ণ হয়ে। মনের ভাব প্রকাশে অনেক সময় তা ব্যর্থও হয়। শব্দব্যবহারের এই ভয় ভেঙে 'জল' ও 'রৌদ্রের' মতো সাধারণ শব্দ দিয়ে মোহময় কাব্যের শরীর তৈরি করে তার ভাবার্থে ব্যঞ্জনা বা বিশেষ ইমেজ তৈরি করেছেন মহাদেব সাহা। শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েই স্বাধীন এক অর্থপ্রকাশ করেছে। ফলে 'জল' আর 'রৌদ্র' তাদের নিজস্ব অর্থবলয়ের বাইরে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। জল ও রৌদ্র দুটোই প্রাণের প্রতীক। বৃষ্টি বা জল নবজন্ম ,স্বপ্ন ও ইতিবাচকতাকে ধারণ করেছে আর রৌদ্র

অমিত শক্তির প্রতীক। পৃথিবীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় এ দুটি পার্থিব উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম ইপ্সিত দুটি উপাদানকে কবিতায় ব্যবহার করে তাদের হরণপ্রয়াসী করে তুলেছেন মহাদেব সাহা। শব্দ-প্রকৌশলী হিসেবে এখানেই কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন তিনি। নিসর্গ, রৌদ্র, সবুজ, সূর্য, জল, বৃষ্টি, চোখ, বুক, ভালোবাসা, দুঃখ এই শব্দগুলোর প্রতি মহাদেব সাহার এক ধরনের দুর্বলতা প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই লক্ষ করা যায়:

সর্বত্র আজ অনাবৃষ্টি, রৌদ্রে পোড়ে মাঠ, বোমায় শহর পোড়ে, লোকালয় উচ্ছন্নে যায়
মারী ও মড়কে কাঁপে দেশ...
...কিংবা ভোর হয় আমাদের সমস্ত অস্তিত্বে রৌদ্র
ওঠে, পাখি নাচে, আমরা কজন এই ভয়ানক রুগ্ন যুবা পুনরায়
মাঠে যাই আমরা নিঃশ্বাস নিই সঙ্গীতের উদার নিসর্গে, আমরা
যেন ধীরে ধীরে বেঁচে উঠি[২২]

শব্দ যেমন অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়ে, তার কার্যকারিতা হারায়, সংযোগসাধনশক্তি লুপ্ত হয় তেমনি নারীও সংসারে তার জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। ক্ষয়ে যাওয়া শব্দের সঙ্গে তুলনীয় নারীর হৃদয়ের উত্তাপ। 'চালের কাঁকর বেছে, পেটভাতে/অঙ্গত নফর' বলে গৃহিণী নারীর প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরেছেন মহাদেব সাহা। শব্দের পরিচর্যা, সঠিক প্রয়োগে যেমন নতুন মাত্রা যোগ হয়, তেমনি নারীকেও আদরে, যত্নে লালন করতে হয়। মহাদেবের কাছে কখনও কখনও নারী ও কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ সমার্থক হয়ে ওঠে। তিনি প্রেমহীন নারীর শরীর ও উত্তাপবিহীন শব্দকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শিল্পভাষ্যে তাদের মৃতসত্তার কথা প্রকাশ করেন এভাবে:

বহু বছরের এই রোদবৃষ্টিজলে, ঝড়ে, কুয়াশায়
নষ্ট হয়ে গেছে প্রেম, মুখের গড়ন তার, দেহের বাঁধন
অজন্তা মূর্তির লাস্য, শিল্পের মতন
সেই গূঢ় সম্ভাষণ[২৩]

সাধারণ শব্দের সারল্যের ভেতরেও থাকে বিচিত্র প্রাণশক্তি। কবির মনের গূঢ় ভাবটিও এসব শব্দে ধ্বনিত হয়ে ওঠে প্রয়োগের যাথার্থ্যে। প্রকৃতি মহাদেব সাহার কবিতার উজ্জ্বলতম অনুষঙ্গ। প্রকৃতি ও নারী একে অপরের পরিপূরক। তারা দুজনেই মানবকে আশ্রয় দেয়, প্রাণিত করে। মহাদেব সাহা তাঁর কবিতায় নারী ও নিসর্গকে একাকার করে ফেলেছেন। নারী প্রকৃতির মতোই রহস্যময়। মহাদেব সাহা মনে করেন, প্রকৃতিরও একটি মন আছে, আছে মানুষের স্বভাব। সবুজ ঘাস তাঁর কবিতায় জাজিম হয়ে ওঠে, মেঘ হয় মখমলের প্রতিরূপ। নিসর্গের অন্তরূপ ধারণ করা প্রকৃতি যেন সেই আদিম নারী, যার ডাকে পুরুষ চিরদিন সাড়া দেয়:

কখনো এই গাছ, বিদেশী পাম ট্রী, কখনো শাদা আরো
সম্পন্ন শরীর সেইসব ভিন্ন যুবতীরা
তাদের সোনালি চুলের স্বাস্থ্যকেই বলি প্রকৃতি
তবু এশিয়া ও ইওরোপে তেমন ভিন্ন কোনো প্রকৃতি নেই
হয়তো নারীরা এখানে শীতপ্রধান, হয়তো বৃক্ষ কোথাও চিরহরিৎ[২৪]

নারীকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিকে নারী হিসেবে দেখার সংস্কৃতি মহাদেব নিজের ভেতরে লালন করেছেন লেখালেখির সূচনাপর্ব থেকে। রোমান্টিক কবি হলেও মহাদেব প্রেমের শুদ্ধতায় বিশ্বাসী। তাঁর প্রেম প্লেটোনিক, শারীরিক নয়। ফলে যৌন-গন্ধী কোনো শব্দ তিনি প্রেমের কবিতায় ব্যবহার করেননি। প্রেম বিষয়ক ইন্দ্রিয়ঘন শব্দের ব্যবহার কৃচিৎ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। কবি হিসেবে শব্দকে চলিষ্ণু ও ভাব-উপযোগী করে তোলার সফল প্রচেষ্টা ছিল মহাদেব সাহার। সাধারণ শব্দের প্রতি দুর্বলতা তাঁর শব্দচেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দ জড়, তাকে গতিদান করেন কবি। মহাদেবের শব্দ মুখ থেকে কলমে এসেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবি-হৃদয়ের সংবেদ। ফলে কবিতায় তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে পারেন: 'আমার হাতে মেঘ পেয়েছে মহিমা, জল পেয়েছে অবয়ব/ পাথর পেয়েছে পূর্ণতা।'[২৫] শব্দ ব্যবহারের নিজস্বতায় মহাদেব সাহা বানানরীতিতেও সৌখিন হয়ে উঠেছেন। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ও কবি হিসেবে বাংলা ব্যাকরণের বানানরীতির বাইরেও শব্দের অর্থগত উপলব্ধির জন্য নিজস্ব বানান ব্যবহার করেছেন। যেমন, শাদা (সাদা) [জীবনানন্দও তাই লিখেছেন], ইওরোপে (ইউরোপে), নরোম (নরম) , বড়ো (বড়)। কবি হিসেবে শব্দের যথার্থ অর্থপ্রকাশ অথবা সৃষ্টির কল্লোলধ্বনিকে ধারণ করার প্রত্যয়ে তিনি এই শব্দগুলোকে নিজস্ব বানানের আওতায় নিয়ে এসেছেন। শুধু বানান নয়,শব্দের অর্থকেও তিনি নিজস্ব ভাবনার বলয়ে প্রচলিত অর্থের ভিন্নতায় পরিচালিত করেছেন। যেমন, "বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ" কবিতায় তিনি বলেছেন, 'এখন আমার বছর কাটে বিদেশ বিভুঁয়ে'[২৬]। এখানে বিদেশ বিভুঁয়ে বলতে তিনি গ্রামের বাইরে নাগরিক জীবনকে বুঝিয়েছেন। বিদেশ শব্দটিকে প্রচলিত অর্থের বাইরে মানসিক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন।

বস্তুত শব্দের অর্থ পরিবর্তনশীল বা বলা চলে শব্দ নিজেও পরিবর্তনধর্মী আধান ধারণ করে। সমাজ, সময়, সংস্কৃতি এবং অর্থ শব্দ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শব্দের সংকোচন মূলত শব্দার্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচ্য বিষয়। কোনো শব্দ একক অর্থ ধারণ করে স্থির হয়ে থাকে না। মহাদেব সাহা প্রচলিত শব্দকে তাঁর কবিতার বিষয় ও অন্তর্গত চেতনাকে ধারণ করতে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন।যেমন:

কোনো এক ঝাঁঝালো দুপুরে
সে এসে দাঁড়ালো দরজায়
কী তাঁর বলার ছিলো
কিছুই বললো না
...
তাঁর মুখ ইঞ্জিনের মতো কালো
সে কয়েক দিন দাড়ি কামায়নি।[২৭]

এই কবিতায় দুপুরের সাথে আলোচিত ব্যক্তির মেজাজের সাযুজ্য তৈরি করতে তিনি ঝাঁঝালো শব্দটি দুপুরের আগে যুক্ত করেছেন। মেজাজ ও তেজের তীব্রতা দুই-ই এতে প্রকাশিত হয়েছে। মেজাজের উত্তাপের তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত করতে তিনি মুখকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করেছেন। এভাবে ধাপে ধাপে মহাদেব সাহা শব্দের বুননে কবিতার কাঁথাকে শিল্পের নকশায় ভরিয়ে তুলেছেন।

শব্দের নিরন্তর স্রোতে অর্থ ক্রমাগত ভেসে যায়। জীবন ও সময় নিরন্তর গতিধর্মী, ফলে শব্দও তা আত্মস্থ করে নিজেকে জীবন ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। শব্দ নিয়ে খেলা করা কবিও জানেন এ ক্রমপরিবর্তনের কথা। ফলে সময়ের বিবর্তন ও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় প্রচল শব্দবিন্যাসে কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছেন মহাদেব সাহা:

ভাটিয়ালি গানের আতিথ্য উপেক্ষা করে
তুমি এখন টেপরেকর্ডারে পপ শুনতেই বেশি ভালোবাসো,
মাটির ভরা কলসের চেয়ে
ফ্রিজের দিকেই এখন তোমার চোখ;
তোমার ঢিলেঢালা পাঞ্জাবীর ইমেজ ভেদ করে
এখন বেরিয়ে আসতে চায় জীনসের হাসির ঝিলিক
শীতপ্রধান দেশের লাবণ্যহীন ভূপ্রকৃতির মতোই
মুখে প্রসাধনের চিহ্ন [২৮]

সমাজ যেভাবে বদলায়, তাকে ভিত্তি করে শব্দও নিজেকে নতুনভাবে হাজির করে অথবা নবজন্ম নেয়। কারণ কবির অনুভূতি প্রকাশে শব্দই একমাত্র মাধ্যম। মুক্তক ছন্দের বাঁধনে বেঁধে মহাদেব সাহা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন অলংকারের আভরণে। শব্দ বিশুদ্ধ আবেগ ধারণ করে সত্যকে উন্মোচন করে। মহাদেব সাহা শব্দকেন্দ্রিক নিরীক্ষাপ্রবণ না হলেও শব্দসচেতন। শব্দচেতনার স্বরূপসন্ধান করতে গিয়ে মহাদেব সাহার অলংকার ব্যবহারের নৈপুণ্যে বিস্মিত হতে হয়। উপমা, অনুপ্রাস, রূপক, চিত্রকল্প, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, বিভাবনা ইত্যাদি অলংকারকে তিনি অনায়াস দক্ষতায় কবিতার শিল্পপ্রকরণ সমৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয় প্রবাদ-প্রবচন, ধুঁয়ার ব্যবহারে শব্দের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে কবিতার ইমেজ নির্মাণ করেছেন।

অনুপ্রাস

১. হয়তো বা চলে গেছে উৎসব, উৎসাহ আর উজ্জ্বল সময় আমাদের[২৯]
২. হয়তো বা ঘাসেও ঘাতক আজ ঘাঁটি গেড়ে শিশু খুন করে[৩০]

প্রবাদ

১. ক্ষুধার দীর্ঘ গ্রীবা স্থবির জন্তুর মতো মেলে দেয় লোলুপতা[৩১]
২. আমি শব্দহীন নীলিমার মতো ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময়[৩২]

উৎপ্রেক্ষা

১. এইতো প্রথম প্রকাণ্ড চাঁদ উসকো-খুসকো যেন
অনেকদিনের ধূলিমাখা একখানি মুখ[৩৩]
২. সংসারটা যেন লোকাল ট্রেনের যাত্রী[৩৪]

চিত্রকল্প

১. বিশাল বাঘ জুড়ে আছে আমার সকল
রাস্তা, চোখে তাঁর জ্বলে এক বীভৎস আগুন। সেই ভীষণ
সম্রাট বাঘ আমার অস্তিত্বে বসে প্রত্যহ আমার বুক, চোখের নরম অংশ
গালের কোমল সব ছিন্নভিন্ন করে করে খায়।[৩৫]

২. আজ সেই দীপ্ত ঢাকা কাঁদছে বসে বিক্ষত শহর
বড়ো ভয়ে ভয়ে সে এখন পথ চলে
ককায় বৃদ্ধার মতো নির্জন রাস্তার মোড়ে
জনশূন্য ফ্যাকাসে পার্কে বসে, ঢাকার শরীর জুড়ে ক্ষতচিহ্ন, মাথায় ব্যাণ্ডেজ[৩৬]

রূপক

১. বনের চোখের নিচে যারা পাখির পালক খোঁজে[৩৭]

২. সে কি কবি সুবিধার সবুজ আমিষ ছাড়া যার আহার রোচে না![৩৮]

সমাসোক্তি

১. আমাকে ডাকে শনিবারের ঘনঘোর শেষরাত[৩৯]

২. ক্রোধ পেকে লাল হয়ে ফেটে যাবে একদা[৪০]

বিভাবনা

১. আমরা নীরব তবু প্রতিবাদ জানায় প্রকৃতি[৪১]

২. ক্লিওপেত্রার রূপে চিরকাল বিমূঢ় সীজার-
তবুও চেতনা জুড়ে অন্বেষণ রূপসী কন্যার।[৪২]

প্রবাদ ও প্রবাদপ্রতীম

১. স্বাধীনতা, এখন তোমাকে চাই দীন কাঙালের ঘরে
দুখের মানিক, অন্ধের আপন যষ্টি[৪৩]

২. আমি কারো পথে কোনো দিইনি কাঁটা
আমি কারো পাকা ধানে দিইনি মই[৪৪]

অতিশয়োক্তি

১. বুকের নিচে অসংখ্য উইপোকা কেটে কেটে ক্ষয় করে আমার বয়স, আমার
বুকের হাড় কেটে কেটে ক্ষয় করে তারা[৪৫]

২. দুইচোখ খেয়ে গেছে পৌষের দুই বুড়ো কাক[৪৬]

বিষম

১. আঙুলে অনল লেগে হুতাশন ও জল হয়ে ঝরে[৪৭]

বিপ্রতীপ

১. ...কাল সারারাত
থোকা থোকা মৃত্যু পান করে আমি সুস্থ হয়ে গেছি[৪৮]

বিরোধাভাস

১. ক্রমাগত হেঁটে যায় দ্রুতগামী বাস[৪৯]

শব্দ ব্যবহারে মহাদেব সাহা পক্ষপাতহীন। তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের পাশাপাশি পৌরাণিক উৎস থেকে পৌরাণিক শব্দকেও ভাষানির্মাণে যুক্ত করেছেন।

তাঁর কবিতায় দেশি শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। বিদেশি শব্দ বিসর্জন না দিলেও অযাচিত বিদেশি শব্দ ব্যবহারে তাঁর অনিচ্ছা প্রতিভাত। আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার দুর্লভ তবে দুটি কবিতা তিনি লিখেছেন সিরাজগঞ্জের আঞ্চলিক কথ্যরীতিতে। গুরুচণ্ডালী বর্জন করে ব্যবহার করেছেন চলিত রীতি। স্থানের নাম ফুল, পাখি, বৃক্ষ, নদী ও প্রেমিকার নাম, ইংরেজি শব্দ, পৌরাণিক অনুষঙ্গ ইত্যাদি শব্দভাণ্ডারে কবিতাকে করেছেন ঋদ্ধ। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শাব্দিক দ্যোতনার কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

ক. ফুল: গোলাপ, স্বর্ণচাঁপা, জুই, চামেলী, বেলী, শেফালিকা, চন্দ্রমল্লিকা, শিমুল, জারুল, সন্ধ্যামালতী, ভাঁটফুল, ছাতিম, দোপাটি, পারিজাত, কদম, মল্লিকা, কৃষ্ণচূড়া, ক্যাকটাস, স্থলপদ্ম, মহুয়া, কনকচাঁপা, অর্কিড, কেতকী, কমল, ক্রিসানথিমাম, পারুল, বোগেনভিলিয়া, চেরি, নিশিন্দা, রডোডেনড্রন, মুচকুন্দ ফুল, কুন্দ, করবী, নাগকেশর, কচুরি ফুল, কাশ, মাধবীলতা, কাঁঠালিচাঁপা, রজনীগন্ধা, কামিনী, নীল পদ্ম ইত্যাদি।

খ. নদী: কংস, খোয়াই, ফুলজোড়, কুমার, সুরমা, বংশী, মেঘনা, পদ্মা, মন্দাকিনী, যমুনা, সিন্ধু, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, কীর্তনখোলা, মধুমতী, ব্রহ্মপুত্র, কালিন্দী, ভলগা, মিসিসিপি, আমাজন, টাইগ্রিস, দামোদর, কর্ণফুলী, করতোয়া, তিস্তা, হোয়াংহো, ক্ষীর প্রভৃতি।

গ. স্থান: গাজা, লেবানন, বসনিয়া, দণ্ডকারণ্য, আসাম, বিহার, ত্রিপুরা, সুভাষপল্লী, গ্রীস, পম্পাই নগরী, মধুপুর, সুন্দরবন, শিলং, বলদা গার্ডেন (বলধা গার্ডেন), জাভা, বালিদ্বীপ, হিমাচল, চিলমারী বন্দর, দক্ষিণডিহি, শান্তিনিকেতন, বর্ধমান, বিরাটনগর, কোলকাতা (কলকাতা), তামাবিল, চন্দ্রনাথ পাহাড়, রমনা, কালিদহ, অনন্তপুর, বহরমপুর, দিনাজপুর, নেপাল, মিশর, পাহাড়পুর, মিথিলা, হিমগিরি, জেনেভা, নীলক্ষেত, ফ্রাঙ্কফুট, কক্সবাজার, ফিলিস্তিন, মেলবোর্ন, বেইলী রোড, বার্লিন, মস্কো, চীন, ময়নামতি, মক্কা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পাবনা, সিরাজগঞ্জ।

ঘ. পাখি: চড়ুই, দোয়েল, শ্যামা, তিতির, শালিক, টুনটুনি, ঘুঘু, মাছরাঙা, সাদা বক, প্যাচা, সাদা চিল, বুলবুলি, পাপিয়া, ময়না, টিয়া, বনদোয়েল, কাক, খঞ্জনা, কোকিল, কাদাখোঁচা, চন্দনা, শঙ্খচিল, বাবুই, কাকাতুয়া প্রভৃতি।

ঙ. গাছ: দেবদারু, ঝাউ, শিমুল, পলাশ, শালবীথি, নিম, কৃষ্ণচূড়া, মহুয়া, জারুল, অর্জুন, ছাতিম, কদম, অশোক, বার্চ ট্রি, গজারি, আম, কাঁঠাল, সেগুন, তাল, তমাল, ডুমুর, তুলসী, অশত্থ (অশ্বত্থ), বট, পাকুড়, পাইনবীথি ইত্যাদি।

চ. পৌরাণিক নাম: ইকারুস, দ্রৌপদী, বাল্মীক, যুধিষ্ঠির, রাবণ, শকুন্তলা, দেবযানী, কচ, চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, যক্ষ, একলব্য, ভীষ্ম, দুঃশাসন, যদুবংশ, জটায়ু, ইথাকা, সীতা, অহল্যা, যযাতি, পঞ্চপাণ্ডব, কুবের, অর্ফিয়ুস, অ্যাগামেমনন, মৈনাক, ট্রয়, হেলেন, ক্লিওপেত্রা, সিজার, সিন্দাবাদ প্রমুখ।

ছ. ইংরেজি শব্দ: রেনিডে, ভিজিটিং কার্ড, হাইরাইজ, হুইসিল, থার্টিফার্স্ট, ফ্যাশান শো, রেনকোট, ব্ল্যাক আউট,ব্যালে, রিভার, বেসিন, ব্রিজ, রিসিভার, নিউইয়ারগ্রিটিংস, ডিশ চ্যানেল, সিডিরম, মডেল, লাইটপোস্ট, ক্লাব, কালার ব্লাইন্ড, কেয়ারি, ফুটনোট, হার্ডডিস্ক,মাউস, ওয়েবসাইট, অর্কেস্ট্রা, বিউগল, মনুমেন্ট, মাউথ অগান, টাওয়ার, ক্লিনশেভ, ফার্স্টবয়, ফিশ, ইংলিশ, স্টোর, এভেন্যু, ইমেজ, মিউজিয়াম, অ্যাকুইরিয়াম, এন্টিক, কার্নিশ, কার্পেট, গ্রিল, ডিভান, সাফা, ট্রান্সপেরেন্ট, ক্যাসেট, ম্যানসন, ক্রেন, ক্যামুয়াজ, শর্ট লীভ, ব্যারিকেড, ব্যারেল, ফ্লাওয়ারশপ, সুপার মার্কেট, ইলেকট্রিক বিল, ফ্যাক্টরি, ফটোগ্রাফ, হ্যান্ডবিল, পোস্টাপিস, কলিং বেল, লিরিক, গাউন ইত্যাদি।

জ. প্রাণি: কাঠবেড়ালী, কৃমি, জোনাক পোকা, ঘুণপোকা, উঁই, শার্দুল, নরখাদক, চিতাবাঘ, ট্যাংরা, পুঁটি, মহিষ, ইঁদুর, বিড়াল, ম্যামথ, অক্টোপাস, ফড়িং, জিরাফ, তক্ষক, জলহস্তী, সিন্ধুঘোটক, মাছ, কাচকি মাছ, সুবর্ণখড়িকা, গাধা, গরু, কুকুর, বাঘ, হরিণ, মৌমাছি, গাভী, প্রজাপতি, বুনো ষাঁড়, সিংহ, চিল, হায়েনা, কেউটে, পিঁপড়ে, উট, ঝিনুক, ইলিশ, রাজহাঁস, ঝিঁঝি, সরপুঁটি, হাতি, ঘোড়া, সাপ, কচ্ছপ ইত্যাদি।

ঝ. যুদ্ধ ও যুদ্ধসংক্রান্ত শব্দ: বোমা, গ্রেনেড, রাইফেল, ছুরি, বারুদ, পিস্তল, স্টেনগান, কার্তুজ, ধনুক, শর, তরবারী, সৈনিক, খড়্গ, হাতুড়ি, আততায়ী, কারফিউ, ব্যারিকেড, মেশিনগান, গুলি, সম্মেলন, পতাকা, গেরিলা, মুক্তিযোদ্ধা, বুলেট, ট্যাঙ্ক, মাইন, রণসজ্জা, কাস্তে, বোমারুবিমান, রণক্ষেত্র, বর্শা, ক্রলিং ইত্যাদি।

ঞ. কবি-সাহিত্যিক: রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল, বিভূতিভূষণ, দান্তে, বোদলেয়ার, বেগম রোকেয়া, রজনীকান্ত, আবুল হাসান, মলয় ভৌমিক, বিনয় মজুমদার, রিলকে, ব্লেক, কালিদাস, বেঞ্জামিন মলয়সি, পাবলো নেরুদা, লোরকা, মায়াকোভস্কি, কীটস, বিদ্যাসাগর, গালিব, রুমী, জসীমউদ্দীন, মাইকেল মধুসূদন, উইলিয়াম কেরী, অতুলপ্রসাদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পাস্তেরনাক, ইয়েটস প্রমুখ।

ট. রাজনীতিবিদ: সূর্য সেন, মওলানা ভাসানী, ইন্দিরা গান্ধী, সালভাদর আলেন্দে, লেনিন, রেগান, বুশ, নেরুদা, জন.এফ. কেনেডি, লুমুম্বা, গান্ধী প্রমুখ।

ড. চিত্রশিল্পী: জয়নুল, যামিনী রায়, পাবলো পিকাসো, পিগম্যালিয়ন, শাগাল, কামরুল, মাতিস, রঁদা প্রমুখ।

ঢ. বৈজ্ঞানিক শব্দ: মাইক্রোফোন, বেতার, টিভি, টেপরেকর্ডার, তেজস্ক্রিয়তা, লেসার, রোবট, পরিফেরা, প্রোটোজোয়া, রিখটার স্কেল, অঙ্কুরোদগম, ভূগোল, পদার্থ, হিমঘর, টেলিফোন, আলোকবর্ষ, নভোযান, মহাশূন্য, কক্ষপথ, সৌর বছর, জ্যোতির্বিদ, বিদ্যুৎ, ভ্রূণ, বায়ুমণ্ডল, গ্লুকোজ, স্যানাটোরিয়াম, হাসপাতাল, কম্পিউটার, মাউস, সিডিরম ইত্যাদি।

ণ. তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দ: বৈকল্য, ঋষি, বিষাদ, কৃতাঞ্জলি, দেউটি, সৌহার্দ্য, উপল, সস্তা, হুজুর, কোষ্ঠী, হুতাশন, অনল, পিতা, হরণ, মোনাজাত, মাজার, নফর, ঈশ্বর, কল্যাণ, শুশ্রূষা, সৌরভ, লৌহ, গেরিলা, চম্পট, জিন্দাবাদ, বাৎসল্য, কণ্টক, শাবক, যামিনী, বল্কল, গোবৎস, আউলিয়া, গ্রন্থরাজি, হদ্দ, মহার্ঘ, সঞ্জীবনী, দজ্জাল, খারিজ, বেহেস্ত, রেস্তোরাঁ, ব্যাধ, সওয়ার, গর্দান, বাণ, মিসট্রেস, শরণ, নিষাদ, বৃক্ষ, ঐশী, সহস্র, কিশলয়, সুফী, দরবেশ, শবেবরাত, কর্ণ, রজনী, অনঙ্গ, গিরিশৃঙ্গ, দাওয়া, আশিক, মাশুক, গহীন, লেবাস, গ্লাস, বিবাহ ইত্যাদি।

ত. যানবাহন ও যানবাহন সংক্রান্ত শব্দঃ ট্রেন, বাস, জাহাজ, ট্রাক, সাইকেল, নৌকা, গরুর গাড়ি, প্লেন, সাম্পান, গণ্ডোলা, ভেলা, শ্যালো, ট্রাক্টর, নাও, রেলগাড়ি, স্লেজগাড়ি, ইস্টিমার, বিমান, এরোপ্লেন, মাস্তুল, মাঝি, রানওয়ে, টিকিটঘর, বোয়িং, ডবল ডেকার, ঘাট, ড্রাইভার, স্টপেজ, গাড়ি, ইস্টিশন, ট্রাফিক পুলিশ, হুইসিল ইত্যাদি।

থ. লোকজশব্দঃ গহনার নাও, অষ্টমীর মেলা, নবান্ন, আলপনা, আলতা, ভাইফোঁটা, শিলনোড়া, নুনমরিচ, কলস, কাঁকর, সাতভাই চম্পা, মাটির বাড়ি, কাঁসার বাসন, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, লোকগাথা, কাঁথা, বেত, বাঁশ, গোবর-চোনা, খড়, ছাউনি, চাটাই, শানকি, বাঁশের মাচা, চিড়া, মুড়ি, গুড়, খুদ বাটা, দৈত্য, গঞ্জ, হাট, ভাসান, ঘুড়ি, বোষ্টম, কুঁড়েঘর, আঙিনা, উঠোন, আলগা, যাত্রা,সার্কাস, রাসমেলা, লৌকিক পালা, মেলা, কুটিরশিল্প, তাঁতকল, রূপকথা, টিনের ঢোল, ফেনাভাত, নৌকাবাইচ, রথের মেলা, ডুলি, বাঁশি, পালকিবাদামের নাও, পাটালি গুড়, চিড়ের মোয়া, সার্কাসের তাবু, ডালবাটা, তালপাখা, কাঠের পুল, বাঁশি, খঞ্জনি, একতারা, নকশীকাঁথা, রাক্ষস, মন্ত্রপাঠ, উলুধ্বনি, শাঁখ, হালখাতা, মোয়া, নারকেল নাড়ু, কাঁচাকলা, পেঁপেসিদ্ধ, শিঙি মাছের ঝোল, গন্ধভাদুলী, শুক্তাপাতা, চড়কমেলা, বৈশাখী মেলা, পাতালপুরী, শীতলপাটি, হাতপাখা, পাটিসাপটা, কুশলীপিঠা প্রভৃতি।

দ. মাস ও বারঃ বৈশাখ, হেমন্ত, অঘ্রান, শীত, বসন্ত, ফাল্গুন, ফাগুন, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, বর্ষা, শরৎ, ফেব্রুয়ারি, আগস্ট, গ্রীষ্ম, মার্চ, অটাম, জানুয়ারি, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, চৈত্র, শনিবার, রবিবার ইত্যাদি।

পোশাক তৎসম্পর্কিত শব্দঃ লাল মোজা, পশমের টুপি, কাশ্মিরী শাল, উল, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, চাদর, শাড়ি, জামা, মুকুট, কার্ডিগান, গেঞ্জি, রুমাল, গরদের শাড়ি, কাতান, হাফপ্যান্ট, বোতাম, ঘোমটা, ফিতা, শার্ট, পাজামা, জামদানি, ফ্লানেল, খদ্দর, লেবাস প্রভৃতি।

ন. আঞ্চলিক শব্দঃ অ্যাহন, রাইত, যামু, দেওয়া, কোন হানে, ডোয়ার, হাথে, ভাইস্যা, ডর, খাওন, বান, হুনছি, ভাবতাছো, জাগা, মরমু, ঝরত্যাছে, চায়াও, তয়, চোহের, সইবার, আলুথালু, ককায়, কালিঝুলি, বিকিচ্ছিরি, আন্ধার, কান্দে, প্যানপ্যানানি, টাল্টিবাল্টি, ভদ্দলোক ইত্যাদি।

প. বাদ্যযন্ত্রঃ পিয়ানো, মাউথ অর্গান, হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, খঞ্জনি, একতারা, অর্কেস্ট্রা, ডুগডুগি, গীটার, বিউগল, বেহালা প্রভৃতি।

ফ. সাগরঃ বঙ্গোপসাগর, আটলান্টিক, লোহিত সাগর, ইংলিশ চ্যানেল ইত্যাদি।

ব. ফলঃ আঙ্গুর, তরমুজ, আম, কাঁঠাল, শশা, কমলালেবু, চিনিচম্পা কলা ইত্যাদি।

ভ. প্রেমিকাঃ নীলা, সীতা, ফারিহা, মল্লিকা, অপরাজিতা, রুমা, গৌরী, ছবি, শকুন্তলা, মোনালিসা, কনকলতা, রাজেশ্বরী, নবীনা, অরুণা, কল্যাণী, শানু, শেফালি, শ্রীমতি মানসী মিত্র, রাধা প্রমুখ।

ম. বিশেষণবাচক শব্দঃ ধূসর মরু, নিঃসঙ্গ যাত্রী, দীর্ঘ গ্রীবা, অতল গভীর, হিমবৃষ্টি, বিমর্ষ মাঘ, হলুদ পাতা, শুষ্ক নদীখাত, করুণ নিঃশ্বাস, শব্দহীন বাঁশি, তীব্র নখ, সুমিষ্ট গোলাপ, কঠিন কামড়, সবুজ প্রান্তর, পরিপূর্ণ রসদশালা, দীপ্য ধনুক, নির্মম শব্দাবলি, দুঃখের টিকিট, নির্জন কান্না, সোনালি চাবুক, সবুজ সুখ, কোমল আনন্দ, সুখের সংসার, কাঠের ঘোড়া, শ্যামল নদী, সঙ্গীহীন মধ্যরাত, শব্দের কাঙাল, রুক্ষ চুল, দুঃস্বপ্নের হাত, করুণ কণ্ঠ, সুদূর নীলিমা, কালো জামা, কোমল হাত, মৃত রবিবার, নিঃসঙ্গ স্বর, ফলন্ত রোদ, নিষ্প্রদীপ শহর, নিঃশব্দ শহর, পুরনো বারান্দা, হাল্কা জাহাজ, মৃত চাঁদ, দুর্বার বোয়িং, বাষ্পীয় ইথার, গাঢ় আঁধার, গভীর কালো ইত্যাদি।

য. নেতিবাচক শব্দঃ শীতের শিশির, কুয়াশা, অনল, অমানিশা, হিমঝড়, উল্কাবৃষ্টি, ধূসর মরু, কাঁটা, পিপাসা, নিঃসঙ্গ যাত্রী, তুষার, বিজন পার্বত্য পথ, খাদ, পতন, মেঘবৃষ্টি, রৌদ্র, শূন্যতা, মেঘ, বাঁশি, শীতকাল, হিমবৃষ্টি, অপরাহ্ন, বিমর্ষ মাঘ, হলুদ পাতা,বরফ, শুষ্ক নদীখাত, শীতের প্রান্তর, ক্ষুধা, মৃত চাঁদ, হৃতরাজ্য, অন্ধকার, জলশূন্যতা, চেঙ্গিস খান, অনাবৃষ্টি, নিখোঁজ সংবাদ, ফ্যাকাশে, রক্তাক্ত পতাকা, খাঁ খাঁ শূন্যতা, খোসা, জলদস্যু, বন্যা, হাতল ভাঙা মলিন চেয়ার, তুষার, রজনী, ভয়ের জ্যামিতি, খাঁচা, চাঁদের কবর, পিপাসা, জলশূন্যতা, ফ্যাক্টরীর ধোঁয়া, তক্ষকের ডাক, শীতল চোখ, ব্রনের দাগ, অশোকের দীর্ঘশাখা, দাঙ্গা, বুর্জোয়া, শূন্য তাবু, ভাঙা চাঁদ, লাশভরা ট্রাক, নষ্ট বালব (বাল্ব), কালো পাথর, পথের ভিক্ষুক, মৃত সৈনিকের জামা, নষ্ট শিশু, অমাবস্যা ইত্যাদি।

র. নবজীবনের প্রতীকঃ কিশলয়, অরণ্য অর্কিড, বসন্ত, সুমিষ্ট গোলাপ, সবুজপ্রান্তর, জ্যোৎস্না, প্রদীপ্ত বিপ্লব, একুশ, রোদ, জলকুমার, পরমজল, সূর্যোদয়, খাঁটি সোনা, ফাগুন, ভরা নদী, সূর্য, উষ্ণ জ্যাকেট, নীলকমল, নদী, স্বপ্ন, লতা, সবুজ বৃক্ষ, বীজ, শস্যভূমি, স্বর্ণচাঁপা, হেমন্ত, স্বপ্নপুরী, পাকা ধান, শস্যের তালুক, হরিণ শাবক, রাঙা ক্ষেত-খামার, পূর্ণিমা ইত্যাদি।

ল. সংখ্যাবাচক শব্দঃ চার, ষোড়শ, দুইজন, তেইশ, এক, একশো একটি, সিকি পয়সা, পাঁচ সাতশো, ছয়টি, ৫, ৭, ৯, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৫ ইত্যাদি।

শ. পেশাঃ শ্রমিক, কৃষক, ডাক্তার, পিয়ন, ব্যবসায়ী, রিক্সাচালক, লরি ড্রাইভার, ট্রাফিক পুলিশ, গায়ক, ফকির, কবি, রিপোর্টার, ট্রাকচালক, গণিকা, চোর, পুলিশ, ডাকাত, রাজনীতিবিদ, নার্স, মিসট্রেস, মাঝি, নফর ইত্যাদি।

মহাদেব সাহার কবিতায় রঙ এবং আলোর ভিন্নতা জীবনানন্দ প্রভাবিত। সবুজ রঙের পাশাপাশি মহাদেব কালো ও সাদা রঙ ব্যবহার করেছেন। আলোর ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না ও রৌদ্রকে। মূলত 'রঙ কবিচিত্তের কল্পনাশ্রিত সৃষ্টিশীল অনুভূতির প্রাণবান প্রকাশ। রঙের মাধ্যমেই কবি বা শিল্পী তাঁর সত্তাস্থিত প্রতিফলিত জগৎকে উন্মোচন করেন।'[৫০] রঙ মনোজগতের স্মারক হলেও ষাটের কবিতায় রঙের প্রকাশ মূলত একই রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধতা, উন্মুল জীবন, নঞর্থক জীবনবাস্তবতা, দুঃখবাদী চেতনা ও বৌদ্ধিক দর্শনজাত। যেমন:

১. ভোর;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল:
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।[৫১] (জীবনানন্দ দাশ)

২. এক গ্লাস হরিদ্রাভ গঙ্গাজলী, নীলিমায়
হেঁটে যাবো অথৈ মই বেয়ে, ভয়ঙ্কর
ক্রোধ পেকে লাল হয়ে ফেটে যাবে একদা[৫২] (মহাদেব সাহা)

৩. শুকনো পাতারা ঝ'রে সবুজ ঘাসের কানে -কানে
করছে মৃত্যুর খুব মাহাত্ম-কীর্তন?[৫৩] (রফিক আজাদ)

৪. ছিলাম পৃথিবীর শেষ সুন্দরীর মাথার ভিতরে সোনালি মাছ।[৫৪] (আবদুল মান্নান সৈয়দ)

৫. সবুজ তরুর পাশে জ্বলন্ত অঙ্গার লাল দীপ্র থাবা জ্বলে।[৫৫] (হুমায়ুন আজাদ)

শব্দ সচেতন মহাদেব সাহা কবিতার নাম নির্ধারণেও নৈপুণ্য প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন। সৌম্যকান্ত শব্দের প্রতি মহাদেবের একধরনের দুর্বলতা প্রতিটি কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাঁর ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের একটি নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে। সে রীতির উজ্জ্বলতা একান্তই নিজস্ব। তবে সময় এবং সমাজকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করে কুড়িয়ে নেন সাধারণ নুড়ি। কিন্তু এ নুড়ি ব্যবহারের নৈপুণ্যে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। কোনো শব্দই আকস্মিক নয়। পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার বহন করে শব্দ ইতিহাসপ্রবণ ও কালজ হয়ে ওঠে। মহাদেব সাহার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সাল ও কাব্যের নাম এই সত্যকেই প্রমাণ করে:

মানব এসেছি কাছে (১৯৭৩), *কী সুন্দর অন্ধ* (১৯৭৮), *তোমার পায়ের শব্দ* (১৯৮২), *ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস* (১৯৮৪), *আমি ছিন্নভিন্ন* (১৯৮৬), *মানুষ বড়ো ক্রন্দন জানে না* (১৯৮৯), *কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ* (১৯৯০), *অস্তমিত কালের গৌরব* (১৯৯২), *একা হয়ে যাও* (১৯৯৩), *যদুবংশ ধ্বংসের আগে* (১৯৯৪), *কোথায় যাই, কার কাছে যাই* (১৯৯৪), *সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া* (১৯৯৫), *এসো তুমি পুরাণের পাখি* (১৯৯৫), *বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ* (১৯৯৫), *বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই* (১৯৯৬), *ভুলি নাই তোমাকে রুমাল* (১৯৯৬), *তুমিই অনন্ত উৎস* (১৯৯৬) ইত্যাদি।

এই কাব্যগ্রন্থের কালপ্রবাহ সমসাময়িক রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিষয়কে উন্মোচন করে। কাব্যের নামকরণে মহাদেবের রোমান্টিকতার শতভাগ প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর প্রেম, বিরহ, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কাব্যের নামজুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণের শব্দচয়নে সমাজ, সময় ও মানসিক অবস্থার পরিচয় মেলে। কবিতা, কবি ও পাঠকের মধ্যে ভাষিক যোগাযোগের উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। মহাদেবের নির্বাচিত শব্দশৃঙ্খলা তাঁর কবিমেজাজের অনুবর্তী। তবে তিনি নিজেই নিঃসঙ্গ ও স্বভাবলাজুক হওয়ার কারণে তাঁর ব্যবহৃত শব্দ প্রায়শই স্নিগ্ধ ও কোমল। এমনকি নেতিবাচক বিষয়বস্তু বা রাজনৈতিক বিষয়াবলিতেও তাঁর শব্দ উচ্চকিত নয়। সময়ের অভিঘাত তিনি ধারণ করেন কিন্তু খোলস ভেঙে নিজের বৃত্তের বাইরে আসেন না। বরং শব্দের আয়ুধ তৈরি করে পৃথক সত্তা বিনির্মাণ করেন।

মহাদেব সাহা মূলত গদ্যাভিমুখী কবি। কবিজীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি তিনি গদ্যছন্দের অলংকারে কাব্যদেহ সাজিয়ে তুলেছেন। নিরাভরণতা তাঁর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ভাষার প্রতিটি স্তরে তিনি শব্দ নিয়ে নিরীক্ষা করে গেছেন। বলা চলে, 'আটপৌঢ়ে শব্দের শাড়িতে জড়িয়ে নিজ কাব্যভাষাকে করে তুলেছেন অপরূপা।'[৫৬]

ষাটের পরিবৃত্তে আবদ্ধ থেকে তিরিশের কাব্যধারার প্রলম্বিত উত্তরাধিকারী মহাদেব সাহা। তিনি কবিতা নির্মাণে শব্দপ্রয়োগ ও অর্থসৌন্দর্যে সদা সচেতন। শব্দালংকার ও অর্থালংকারের যথার্থ প্রয়োগে তাঁর মুন্সিয়ানার ছাপ লক্ষ করা যায়। শব্দকে তিনি নিজস্ব মনস্বিতা, প্রজ্ঞা ও আবেগ দ্বারা চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তবে শব্দ নির্বাচনে তাঁর কিছু পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। বিশেষত বিষয়নির্বাচনের পুনরাবৃত্তিতে একই শব্দের ব্যবহারে কবিতার গতি শ্লথ হয়েছে। ফলে শব্দোত্তর ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে মহাদেব সাহার কিছু কিছু কবিতা। তবে তাঁর কাব্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে এ কথা বলা যায় যে, মহাদেব সাহা শব্দচেতনার কুশলী কারিগর।

কাব্যে ব্যবহৃত গতানুগতিক ও প্রাত্যহিক শব্দকে তিনি করে তুলেছেন তিলোত্তমা। চলিত গদ্য রীতির কারণে তিনি গদ্যগন্ধী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দকে একারণে মোটেও আরোপিত মনে হয় না। ভাব অনুষঙ্গী ভাষা ও ভাষার কক্ষপথে শব্দের সঠিক অবস্থানে কবির দক্ষতা প্রশংসার দাবি রাখে।

তথ্যনির্দেশ

[১] জুলফিকার হায়দার, 'ষাটের কবিতা: সন্ত্রস্ত সময়ের শিল্প', *নান্দীপাঠ*, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা., সংখ্যা ৫, ২০১৩, পৃ. ১৯২
[২] বায়তুল্লাহ কাদেরী, 'ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', *নান্দীপাঠ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০
[৩] মহীবুল আজিজ, 'ষাটের কবিতা', *নান্দীপাঠ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
[৪] Stephen J. Brown, *The World of Imagery,* Kegan Paul, trench, Trubrer and Co. Ltd., London, 1927, p. 7
[৫] মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা: তুলনামূলক ধারা (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩), পৃ. ৩১৫
[৬] William Wordsworth, *Wordsworth's Literary Criticism*, Edt. by Nowell C. Smith, Oxford University Press, 1925, p. 15
[৭] উদ্ধৃত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক (২য় সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০৭), পৃ. ১-৬
[৮] John Keats, *Ode o a Grecian Urn*, Chisick Press, 1897, p. 236
[৯] মহাদেব সাহা, "শব্দ", 'চাই বিষ অমরতা', *কাব্যসমগ্র ১* (তৃতীয় সং, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১), পৃ. ১৪৪
[১০] মহাদেব সাহা, "ক্ষুধা", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ২৩
[১১] মহাদেব সাহা, "আজীবন একই চিঠি", তদেব, পৃ. ২৫
[১২] মহাদেব সাহা, "এরোপ্লেন", তদেব, পৃ. ২৭
[১৩] মহাদেব সাহা, "ভালোবাসার স্পট", 'ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস', তদেব, পৃ. ২৮৬
[১৪] মহাদেব সাহা, "প্রেমের চেয়েও সেই মানুষের বিদ্রোহ সুন্দর", 'কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ', তদেব, পৃ. ৪২০
[১৫] মহাদেব সাহা, "আমার দুঃখগুলি", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৪০
[১৬] মহাদেব সাহা, "কারো সাথে কারো দেখা হয় না", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৪৬
[১৭] তদেব, পৃ. ৪৭
[১৮] মহাদেব সাহা, "তোমাকে উৎসর্গ, দুঃখ", 'চাই বিষ অমরতা', তদেব, পৃ. ১২৯
[১৯] মহাদেব সাহা, "বন্ধুর জন্য বিজ্ঞাপন", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৩৪
[২০] মহাদেব সাহা, "তুমি বড়ো হরণইচ্ছুক", 'মানব এসেছি কাছে', তদেব, পৃ. ৯৭
[২১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, (একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ৩১-৩২
[২২] মহাদেব সাহা, "রবীন্দ্রোত্তর আমরা কজন যুবা", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
[২৩] মহাদেব সাহা, "ভালোবাসা মরে গেছে গত গ্রীষ্মকালে", 'মানব এসেছি কাছে', তদেব, পৃ. ১০৩
[২৪] মহাদেব সাহা, "তাকেই বলি প্রকৃতি", 'চাই বিষ অমরতা', তদেব, পৃ. ১১৪
[২৫] তদেব
[২৬] মহাদেব সাহা, "বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৩০
[২৭] মহাদেব সাহা, "রাগ", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৪০
[২৮] মহাদেব সাহা, "তুমি, এক অজ্ঞাত মানুষ", 'ধুলোমাটির মানুষ', তদেব, পৃ. ২৫৪-২৫৫
[২৯] মহাদেব সাহা, "আলস্যপ্রহর", 'কী সুন্দর অন্ধ', তদেব, পৃ. ১৬৭
[৩০] তদেব
[৩১] মহাদেব সাহা, "ক্ষুধা", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ২৩
[৩২] মহাদেব সাহা, "আমার কণ্ঠ কেউ থামাতে পারবে না", 'মানুষ বড়ো ক্রন্দন জানে না', তদেব, পৃ. ৩৪৫
[৩৩] মহাদেব সাহা, "চাঁদ দেখে মনে পড়ে", 'ধুলোমাটির মানুষ', তদেব, পৃ. ২৪৪
[৩৪] মহাদেব সাহা, "জীবনযাত্রা", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৬৩
[৩৫] মহাদেব সাহা, "ক্ষুধা", তদেব,পৃ. ২৩
[৩৬] মহাদেব সাহা, "নিজস্ব অ্যালবাম", 'প্রথম পয়ার', তদেব, পৃ. ৩৯৪
[৩৭] মহাদেব সাহা, "তার বুকে আছে", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ২৬
[৩৮] মহাদেব সাহা, "কবি কেন কাপুরুষ", 'কী সুন্দর অন্ধ', তদেব, পৃ. ১৬৬
[৩৯] মহাদেব সাহা, "হাতে ব্যক্তিগত খাঁচা", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৪৯
[৪০] তদেব
[৪১] মহাদেব সাহা, "অন্ধ", 'কী সুন্দর অন্ধ', তদেব, পৃ. ১৫৪
[৪২] মহাদেব সাহা, "যাত্রী", 'প্রথম পয়ার', তদেব, পৃ. ৩৭১
[৪৩] মহাদেব সাহা, "এখন তোমাকে", 'তোমার পায়ের শব্দ', তদেব, পৃ. ২১১
[৪৪] মহাদেব সাহা, "আমায় কেনো ফোঁটাও কাঁটা", 'কোথা সেই প্রেম কোথা সেই বিদ্রোহ', তদেব, পৃ. ৪২৪
[৪৫] মহাদেব সাহা, "বিষণ্নতা রুগ্নতা", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ৪৮
[৪৬] মহাদেব সাহা, "ভালোবাসা মরে গেছে গত গ্রীষ্মকালে", 'মানব এসেছি কাছে', তদেব, পৃ. ১০৩

[৪৭] মহাদেব সাহা, "কোথাও আছেন তিনি", 'মানব এসেছি কাছে', তদেব, পৃ. ৯৩

[৪৮] মহাদেব সাহা, "শীতের সেবায় তবে সেরে উঠি", 'কী সুন্দর অন্ধ', তদেব, পৃ. ১৪৭

[৪৯] মহাদেব সাহা, "এরোপ্লেন", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', তদেব, পৃ. ২৭

[৫০] বায়তুল্লাহ কাদেরী, *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ* (নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯), পৃ. ১৯৯

[৫১] জীবনানন্দ দাশ, "শিকার", 'বনলতা সেন', কবিতাসমগ্র (পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা, ২০০৫), পৃ. ১৬০

[৫২] মহাদেব সাহা, "হাতে ব্যক্তিগত খাঁচা", 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

[৫৩] রফিক আজাদ, "মধ্যরাতে শোকগাথা", 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া', *কবিতাসমগ্র* (২য় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬), পৃ. ১৩৫

[৫৪] আবদুল মান্নান সৈয়দ, "শহরে অচেনা মাছ", *কবিতাসমগ্র* (শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৮৬

[৫৫] হুমায়ুন আজাদ "থাবা", *কাব্যসংগ্রহ*, (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮), পৃ. ৭৮

[৫৬] তহমিনা তানিয়া, *মহাদেব সাহা/আমূল উদ্বাস্তু* (অনন্যা, ঢাকা, ২০১০), পৃ. ১৯০